পল্লী উন্নয়ন ও তথ্যপ্রযুক্তি: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

নগরায়নের ব্যাপক বিস্তার সত্ত্বেও এখনও বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ বাস করে গ্রামে। এ কারণেই গ্রামের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কিন্তু আমাদের গ্রামগুলো ভাল নেই। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পরিবেশ বিপর্যয় ইত্যাদি নানা সমস্যার মুখে পড়ে আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবনযাপন করছে। এমনই একটি সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির আলোয় গ্রামের মানুষের জীবনকে আলোকিত করার স্বপ্ন নিয়ে কাজ করে চলেছেন কিছু মানুষ। ডিজিটাল ডিভাইডের বাধা সরিয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি যে গ্রামের মানুষের জীবনে টেকসই উন্নয়ন ঘটাতে পারে এটি আজ আর কোনো অলীক কল্পনা নয়। আমাদের দেশে টেলিসেন্টার উদ্যোগের সাফল্যের প্রেক্ষিতে এ কথাটি আজ বুক ফুলিয়েই বলা যায়। পল্লী উন্নয়নে টেলিসেন্টারসহ নানাবিধ প্রযুক্তি উদ্যোগ এখন কোন পর্যায়ে আছে সেটা জানার উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা সাজিয়েছি আমাদের এবারের মাস্টারফাইল। লিখেছেন সি নিউজ-এর নির্বাহী পরিচালক কাজী মোস্তাক গাউসুল হক। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনিরুল হক ফিরোজ ও নুরুন্নবী হাছিব।

একথা সবাই মানেন, বিংশ ও একবিংশ শতকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নগরায়ন। ১৯০০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ২২ কোটি লোক বাস করত নগরে, মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে এটি হয়ে যায় ২৯ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় ৭৫ কোটি। আর ২০০5 সালে এসে এটি দাঁড়িয়েছে ৪৯ শতাংশ, অর্থাৎ ৩২০ কোটির মত। জাতিসঙ্ঘের 'ওয়ার্ল্ড আরবানাইজেশন প্রসপেক্ট রিপোর্ট ২০০5' অনুসারে ২০৩০ সাল নাগাদ নাকি নগরে বাস করা মানুষের সংখ্যা দাঁড়াবে ৬০ শতাংশ, মানে ৪৯০ কোটিতে। কিন্তু নগরায়নের এমন ব্যাপক বিস্তারের পরও এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ এখনও বাস করে গ্রামে। শুধু তাই নয়, ফরাসী অর্থনীতিবিদ ফিলিপ বোকুয়ের 'দি ফিউচারিস্ট' ম্যাগাজিনে এক লেখায় হিসাব নিকাশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন, জাতিসঙ্ঘ নগরায়নের যে ভবিষ্যৎ চিত্র এঁকেছে বাস্তবে নাকি নগরায়ন ততটা হবে না। তাঁর মতে ২০৩০ সালে বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশ নয়, ৫০ শতাংশের মত বাস করবে নগরে। তাঁর মতে, এটি ঘটবে, কারণ বিশ্বে যে হারে নগরায়ন ঘটে চলেছে সেটি স্থায়ী বা টেকসই নয়। বোকুয়ের মনে করেন, নগরের দূষিত পরিবেশে টিকতে না পেরে অদূর ভবিষ্যতে অনেক মানুষ 'এবার ফিরাও মোরে' বলে আবার গ্রামেই ফেরা শুরু করবেন। তার মানে ভবিষ্যতে মানুষের বাসস্থান হিসেবে গ্রামাঞ্চলের গুরুত্ব লোপ পাবার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। গ্রাম তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে ঠিকই টিকে থাকবে। আর এ কারণেই সবুজ বিপ্লবের সেই পুরনো দিনগুলোর মত গ্রামীণ উন্নয়ন এখনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু হিসেবে টিকে আছে। আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে: গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। অন্তত বাংলাদেশের মত একটি দেশের জন্য একথাটি খুবই সত্যি। কারণ এখনও এদেশের জনগোষ্ঠীর বড় অংশটিই থাকে গ্রামে। কৃষি এখনও আমাদের জীবনধারণের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত, আর কৃষির জন্য গ্রামের এখনও কোনো বিকল্প নেই।

গ্রামীণ উন্নয়নে তথ্যের ভূমিকা

আধুনিক সমাজকে তথ্য সমাজ বলা হয়। কৃষি বিপ্লব এবং শিল্প বিপ্লব পেরিয়ে উন্নয়নের তৃতীয় তরঙ্গে আমরা এখন আছি বলে মনে করেন আলভিন টফলারের মত সমাজবিজ্ঞানীরা। এই তৃতীয় তরঙ্গের মূল কাঁচামাল হচ্ছে তথ্য। একথা সবাই জানেন এবং মানেন যে কেবলমাত্র একজন তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিই পারেন নিজের জীবন সম্বন্ধে

সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে। তথ্যময়তা আর তথ্যহীনতার মধ্যে দিন আর রাতের মতই পার্থক্য। যার হাতে তথ্য আছে তার প্রতিটি পদক্ষেপ, কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা সবই হবে জ্ঞান আর তথ্যের আলোকে। আর তথ্য যার নেই তার সবকিছুই হবে অন্ধের মত। কিন্তু মুশকিল হল, শহরে তথ্যের প্রাপ্তি মোটামুটি বাধাহীন হলেও গ্রামের মানুষের জন্য এটা মোটেই সত্যি নয়। অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে গ্রামের মানুষ চাইলেও প্রয়োজনীয় তথ্যটি হাতের কাছে পায় না। আর কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দুর্যোগ প্রতিরোধ, শিক্ষা, জীবিকা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় এসব তথ্যের অভাবে গ্রামের সিংহভাগ মানুষ মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হচ্ছে, বঞ্চিত হচ্ছে সংবিধানস্বীকৃত তাদের মৌলিক অধিকার থেকে।

গ্রামীণ উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভূমিকা
বিংশ ও একবিংশ শতক প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য উন্নতি অগ্রগতির শতক। প্রযুক্তি নিমেষে পাল্টে দিয়েছে বলিভিয়া থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত এই গ্রহের প্রতিটি আনাচ কানাচ। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে প্রযুক্তির সুবিধা সবাই সমানভাবে পায়নি। শহরাঞ্চলে মানুষ যেমন অবস্থানগত সুবিধার কারণে প্রযুক্তির প্রতিটি আশীর্বাদ নিজের জীবনে প্রয়োগ করে ধন্য হয়েছে, গ্রামের মানুষ হয়েছে ঠিক ততটাই বঞ্চিত। আর আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য। প্রযুক্তির আশীর্বাদকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জীবনকে পাল্টে দেবার সবরকম সম্ভাবনা কাগজে কলমে তাদের হাতের নাগালে থাকলেও তারা প্রতিনিয়িত বঞ্চিত হচ্ছে প্রযুক্তির সুবিধা থেকে। বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কথা এখানে বিশেষভাবে বলতে হয়। আমরা জানি, ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে সারা বিশ্ব জুড়ে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে মূল অবদান

রেখেছে প্রযুক্তির উন্নতি এবং অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি খাতেই প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ। কি উৎপাদন, কি বিতরণ বা লেনদেন ব্যবস্থাপনা, সব ক্ষেত্রেই তথ্য সংরক্ষণ, বিশে-ষণ ও যোগাযোগের জন্য নতুন নতুন হাতিয়ার ও কৌশলের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৫০-এর দশকে প্রথম বারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের আবির্ভাবের পর থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে কম্পিউটার প্রযুক্তির উন্নতি ঘটতে থাকে। আজ একবিংশ শতকের শুরুতে যেসব প্রযুক্তি সারা বিশ্ব জুড়ে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে তার প্রায় কোনোটিরই বয়স এখনও ত্রিশ ছাড়ায়নি; এর মধ্যে কোনোটির ইতিহাসতো মাত্র বছর দশকের পুরোনো। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত পারসোনাল কম্পিউটার বা পিসি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য বাজারজাত করা হয় ১৯৮০-র দশকের মধ্যভাগে। হাতে গোনা অল্প কিছু বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের

বাইরে ইন্টারনেটের প্রচলন শুরু হয় ১৯৯০-এর পর থেকে; সাধারণ জনগণের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব-এর ব্যবহারও শুরু হয় ৯০-এর দশকে। আজ যেসব প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের জীবনকে কল্পনা করতে পারি না তার অনেকগুলোরই উন্নয়ন-কাল (development period) ছিল অত্যন্ত স্বল্প সময়ের এবং দাবানলের মতই খুব দ্রুত এগুলোর ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন এবং এ সংক্রান্ত নতুন নতুন প্রয়োগিক মডেলের আবির্ভাব তথ্য উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও বিতরণের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত করেছে। জন্ম দিচ্ছে তথ্য সমাজের। আর এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে তথ্যকে দেখা হচ্ছে আধুনিক সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপাদান হিসেবে।

বিশ্বব্যাংক, জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ন তহবিলসহ প্রধান প্রধান বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলোও কিন্তু সমাজ প্রগতিতে জ্ঞান ও তথ্যের ভূমিকাকে অত্যন্তগুরুত্ব দিয়ে দেখছে এবং সেভাবেই বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার ছক কষছে। সবাই দেখতে চাইছে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কিভাবে উন্নয়ন তথ্যকে পৌঁছে দেয়া যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মানুষের দোরগোড়ায়। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনে সবার পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতেই এখন আছে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড। এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে প্রথাগত ও অপ্রথাগত বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেয়া হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে জ্ঞান ও তথ্যকে সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে পৌঁছে দেবার জন্য। এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উদ্যোগের নাম টেলিসেন্টার বা টেলিকটেজ।

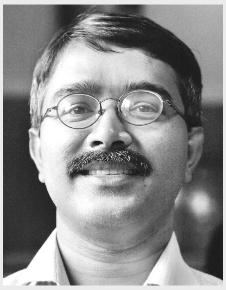

মুনির হাসান
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক

দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে বেশ কিছু আইসিটি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তার মধ্যে সরকারি পর্যায়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রায় ৩০টি ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আরো ৩০টি গ্রামে কৃষি তথ্য ও মৎস্য তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্ক (বিটিএন)-এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে অনেকগুলো তথ্যকেন্দ্র/টেলিসেন্টার স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রামের মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ হয়েছে। কিছু কিছু এনজিও তাদের এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক কর্মকাণ্ড যেমন প্রশিক্ষণ, শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করছে। এসবের মধ্যে ডি.নেট, আমাদের গ্রাম সহ আরো বেশ কিছু এনজিও রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তিকে ঘিরে নতুন আশার সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকজন নানা ধরনের সুবিধা পাচ্ছে, যার মধ্যে ইন্টারননেটের মাধ্যমে প্রবাসী আত্মীয়দের সাথে কথা বলা, সরকারি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ফর্ম ডাউনলোড করে ব্যবহার করা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের সুবিধা অন্যতম। একুশ শতকে বৈশ্বিক গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের গ্রামের সাধারণ মানুষকে প্রযুক্তি সচেতন করে গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। একুশ শতকের জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য তৃণমূল পর্যায়ের সকল মানুষকে তথ্য প্রযুক্তিতে সংযুক্ত করতে হবে। চলমান এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমের মাধ্যমে সংযুক্তির এ কাজটি হবে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমানে যে ধরনের কার্যক্রম চলছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। দেশের গ্রামগুলোকে জ্ঞান গ্রামে পরিণত করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বৃহৎ আকারে প্রকল্প গ্রহণ করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে আগামী দুই বছরের মধ্যে সকল ইউনিয়নে অন্তত একটি তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা যাতে ২০১৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সকল গ্রামে একটি সাধারণ অ্যাকসেস পয়েন্ট থাকে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যুগোপযোগী ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে হবে। এ জন্য অবশ্যই সরকারি ও বেসরকারি নানামুখী উদ্যোগ প্রয়োজন। এসব কার্যক্রমে গ্রামের মানুষদের যত বেশি সম্পৃক্ত করা যাবে ততই ভাল। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর এসব কার্যক্রম সরকারি সেবা, শিক্ষা, যোগাযোগ ও আইনি সহায়তার ক্ষেত্রে গ্রামের দরিদ্র মানুষকে ক্ষমতায়িত করে। বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ আমাদেরকে এ সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এখন দরকার সম্ভাবনাগুলোকে সাফল্যে পরিণত করা।

গণ তথ্যকেন্দ্র বা টেলিসেন্টার

টেলিসেন্টার বা কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার তুলনামূলকভাবে নতুন একটি ধারণা হলেও খুব অল্প সময়ে মধ্যে টেলিসেন্টারের কনসেপ্টটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত কয়েক দশকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে শত শত টেলিসেন্টার, যেগুলোর মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আশীর্বাদে তৃণমূল মানুষের তথ্য প্রয়োজন মেটানো। টেলিসেন্টার পল্লী জনগণের মৌলিক তথ্য ও প্রযুক্তিগত চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এটা হচ্ছে গ্রামের সুবিধাজনক কোনো স্থানে অবস্থিত একটি 'common point of access', যেখানে গ্রামের মানুষ ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, ওয়ার্ড প্রসেসিং ইতাদি প্রয়োজন মেটাতে পারে। এসব টেলিসেন্টারকে দূরশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবেও সহজেই ব্যবহার কার যায়। টেলিসেন্টারের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আছে:

* ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ব্রাউজিং, ইমেইল, কম্পিউটার সেবা।
* প্রযুক্তি ব্যবহারে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ।
* উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণসহ স্থানীয় পর্যায়ে বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস।
* ইলেকট্রনিক ইনফরমেশন অ্যাকসেস।
* কল সেন্টার সেবা।
* স্থানীয় সরকারভিত্তিক তথ্য সেবা, পারস্পরিক আলাপ আলোচনার স্থান হিসেবে ভূমিকা পালন।

জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন এবং আইএডিবি-র

উদ্যোগে পরিচালিত একটি সমীক্ষার রিপোর্টে ফ্রান্সিসকো প্রোয়েনজা, রবার্টো বাস্টিডাস বুচ এবং গুইলারমো মনটেরো মন্তব্য করেছেন, 'টেলিসেন্টার আজকের বিশ্বে পিছিয়ে পড়া দেশগুলো যেসব উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি তার অনেকগুলোকেই ভেঙে দিতে পারে। বিশেষ করে পল্লী উন্নয়নে এসব সেন্টার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।' টেলিসেন্টারের সুবাদে গ্রামের সাধারণ একজন মানুষ নানাভাবে তাঁর জীবন জীবিকার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন। তাঁর উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার যাচাই করতে পারবেন, সন্তানকে কোথায়, কোন বিষয়ে পড়ালে ভাল হবে সেটি জানতে পারবেন, অসুখ বিসুখ হলে কিভাবে সেটি নিরাময় করতে হবে তা জানতে পারবেন, কিভাবে ঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি মোকাবেলা করতে হবে তাও জানবেন, মাউসের একটি মাত্র ক্লিকেই। সব মিলিয়ে টেলিসেন্টার পল্লী অঞ্চলের জনগণের মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারে সাফল্যের হাসি।

বাংলাদেশ ও টেলিসেন্টার

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের কাছে এখন আর কোনো সুদূরের রূপকথা নয়। মোবাইল ফোনের কল্যাণে যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধা এখন পৌঁছে গেছে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রত্যন্ত গ্রামটিরও আনাচে কানাচে। সে সঙ্গে 'কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার' তথা টেলিসেন্টারের কনসেপ্টও ধীরে ধীরে হলেও এদেশের মাটিতে শেকড় গাড়তে শুরু করেছে। ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ নেটওয়ার্ক (ডি.নেট) এদেশে টেলিসেন্টার স্থাপনের ওপর একটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করে রংপুরে। এ কর্মশালা আয়োজন করতে গিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ফর রেডিও কমিউনিকেশন

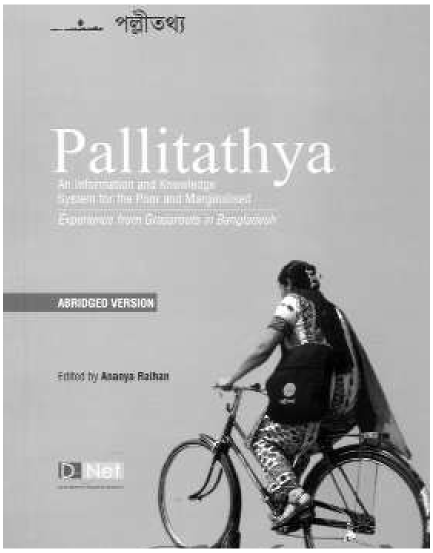

(বিএএনএনআরসি) এবং ইয়ং পাওয়ার ফর সোশ্যাল অ্যাকশন (ওয়াইপিএসএ) নামে দুটি সংগঠনের সহায়তা পায় ডি.নেট। আন্তর্জাতিক টেলিসেন্টার আন্দোলনে সমর্থন জোগানো সংস্থা telecentre.org এবং ইউএনডিপি বাংলাদেশও সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয়। এ কর্মশালায় ৫৭টি সংগঠন অংশগ্রহণ করে এবং একে অন্যের সঙ্গে টেলিসেন্টার স্থাপন ও পরিচালনা সংক্রান্ত মূল্যবান অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

সকল টেলিসেন্টার উদ্যোক্তা মিশন ২০১১ নামে

ড. অনন্য রায়হান
নির্বাহী পরিচালক, ডি.নেট

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দিচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের মানুষকে প্রযুক্তির বিভিন্ন সুবিধা দেয়া। এ কাজটি এখনো পর্যন্ত মূলত বেসরকারিভাবেই হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতিও সাধিত হয়েছে। তবে সবাইকে এ সুবিধার আওতায় আনার জন্য এ কার্যক্রম দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন সরকারি উদ্যোগ। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের কার্যক্রম যত বেশি ছড়িয়ে দেয়া যাবে ততই ভাল।

আশার কথা হচ্ছে ইদানীং সরকারি উদ্যোগেও এ ধরনের বেশকিছু কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সারাদেশব্যাপী ইউনিয়নগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি প্রত্যেক সংসদীয় এলাকায় বাংলা ও ইংরেজিতে একটি করে ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হবে যেখানে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সমস্যার কথাও জানাতে পারবেন। এছাড়াও আরো বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এ ধরনের কার্যক্রমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন। বিভিন্ন পেশার মানুষজন যেমন এর সুবিধা পাচ্ছেন তেমনি শিশু থেকে বৃদ্ধরা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবা পাচ্ছে। কৃষকরা ফসল বোনা থেকে শুরু করে ফসল ঘরে তোলা পর্যন্ত সব সেবা পাচ্ছে। মহিলারা স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষার্থীরা তাদের ফলাফল, ভর্তি তথ্য পাচ্ছেন। কৃষি ও শিল্প উদ্যোক্তারাও সুবিধা পাচ্ছেন। এছাড়াও এলাকা ভিত্তিক বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সেবাও পাওয়া যাচ্ছে। এ কার্যক্রমগুলো যতবেশি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়া যাবে ততই বেশি মানুষ উপকৃত হবেন। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে নিজেদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার ফলে জাতীয় প্রবৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাবে অনেকখানি। এ কার্যক্রমগুলোর সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষরাই জড়িত। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই স্থানীয় কর্মীদের নিয়ে কাজ করে। এতে যেমন স্থানীয় মানুষদের কর্মসংস্থান বাড়ছে তেমনি কাজের ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় মানুষদের সম্পৃক্ততা এ ধরনের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে ভীষণভাবে। আর এ কারণেই এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দিতে হবে গোটা দেশের আনাচে কানাচে। তবে শঙ্কার কথা হচ্ছে, এ ধরনের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যে ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সহযোগিতা প্রয়োজন তা পুরোপুরি পাওয়া যাচ্ছে না। এ পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা ছাড়া তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়।

হাবিবুল-লাহ এন করিম

সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটঅয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)

আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে যেহেতু সড়ক যোগাযোগ সুবিধা বেশি ভাল নয়, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষ অনেক তথ্য পেয়ে যেতে পারে যেটা আগে হয়ত তাদেরকে নিজেরা অন্য কোথাও গিয়ে নিতে আসতে হত। এখন তারা সেটা ইন্টারনেট বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পেতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি তাদের সময় বাঁচাবে, খরচ বাঁচাবে। দ্বিতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে সাধারণত ভাল ডাক্তার পাওয়া যায় না বা ভাল ডাক্তাররা গ্রামাঞ্চলে থাকতে চায় না। সেক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে যদি ইন্টারনেট কিয়স্ক-এর মাধ্যমে টেলিমেডিসিনের সুবিধা দেয়া যায় তাহলে গ্রামের মানুষ অল্প খরচে ভাল ডাক্তারের চিকিৎসা সুবিধা পেতে পারে। তৃতীয়ত, গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় ভাল শিক্ষক পাওয়া যায় না, সেক্ষেত্রে শহর অঞ্চলের ভাল শিক্ষকরা যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রামের স্কুলের ক্লাশ নিতে পারে তাহলে শহরের ভাল স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারে গ্রামের শিক্ষার্থীরা। একইভাবে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন রকম সুযোগ করে দেয়া যায় যেটা আমাদের দেশজ সম্পদ দিয়েই করা সম্ভব। এজন্য শুধুমাত্র কম্পিউটার, টেলিফোন, আর ইন্টারনেট সংযোগ থাকতে হবে। এটা যদি আমরা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে এ ধরনের অনেক সুযোগ সুবিধা দেয়া যায় যেটা গ্রামের মানুষের পক্ষে অন্যভাবে পাওয়া বেশ কঠিন। তবে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধকতা অনেক। প্রথমত, গ্রামাঞ্চলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো খুবই দুর্বল। এ অবকাঠামো যত দ্রুত সম্ভব ঠিক করতে হবে, যেমন অয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, এটা যদি আমরা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিতে পারি তাহলে একটা অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধান হবে। দ্বিতীয়ত, শুধু ব্রডব্যান্ড পৌঁছে দিলে হবে না গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধাও থাকতে হবে। বিদ্যুৎ ছাড়া কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না। বিভিন্নভাবে এ সমস্যা সমাধান করা যাবে। সৌর বিদ্যুৎ বা মানবশক্তি চালিত জেনারেটরের মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। হিউম্যান পাওয়ারড জেনারেটর হচ্ছে বাইসাইকেলের মত জেনারেটর যার মাধ্যমে ছোটখাট স্কেলে লাইট, ফ্যান বা কম্পিউটার চালানো যেতে পারে। এ ধরনের কিছু কিছু প্রযুক্তি যদি আমাদের দেশে জনপ্রিয় করা গেলে এ প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব। তবে সবার আগে বিদ্যুৎ সমস্যা স্থায়ীভাবে দূর করতে হবে। ইন্টারনেট সংযোগকেও গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ব্যবস্থাও একটা বড় সমস্যা। ঘরে যদি বিদ্যুৎ., কম্পিউটার সবই থাকে কিন্তু অক্ষরজ্ঞান না থাকে, তাহলে এই কম্পিউটার প্রযুক্তি কাজে লাগানো যাবে না। এখনও বাংলাদেশে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ। অর্থাৎ এখনও আমাদের অর্ধেক মানুষের অক্ষরজ্ঞান নেই। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব এদেরকে সাক্ষর করতে হবে।

অবকাঠামোগত অসুবিধা দূর করার জন্য যত দ্রুত সম্ভব গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ এবং তথ্যপ্রযুক্তির উপকরণ পৌঁছে দিতে হবে। এখন যে ওয়াইম্যাক্স লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সেটার মাধ্যমে ইন্টারনেট সুবিধা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। আর শিক্ষার প্রসঙ্গ তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, এর কোন বিকল্প নাই। আমাদের দেশে ১০০ ভাগ মানুষ যাতে শিক্ষার মধ্যে আসতে পারে এটার ব্যবস্থা করতে পারে। গত ১৫/২০ বছরে ধরেই শিক্ষার বিস্তার ঘটছে বটে, কিন্তু সেটাকে আরো ত্বরান্বিত করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তারের জন্য বেসিসের পক্ষ থেকে আমরা সরকারকে নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সহায়তা দিয়ে থাকি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাইলট প্রকল্প করে আমরা দেখিয়ে দিই কিভাবে এ ধরনের কাজ করা যেতে পারে। যেমন আমরা মাঝে মধ্যে বিভিন্ন স্কুলে কম্পিউটার অনুদান দিয়ে থাকি বা বিনা মূল্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। বেসিসের পক্ষে তো আর সারা দেশের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, আমরা শুধু দেখাতে পারি কী ধরনের কর্মসূচী হাতে নেয়া দরকার যাতে সরকার বাধাগুলো দূর করতে পারে।

একটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে একে অন্যের সঙ্গে হাত মেলায়। মিশন ২০১১-র লক্ষ্য হচ্ছে ২০১১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪০তম বার্ষিকীতে এদেশের প্রতিটি গ্রামে একটি করে টেলিসেন্টার গড়ে তোলা। একুশ শতকের শুরু থেকেই ডি.নেট এদেশে টেলিসেন্টার ধরনের তথ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার ওপর নানাবিধ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সহায়তায় দারিদ্র্য বিমোচন ও জাতীয় উন্নয়ন।

বাংলাদেশে গ্রামীণ অঞ্চলে সফল টেলিসেন্টার উদ্যোগের উদাহরণ দিতে গেলে সবচেয়ে পুরনো উদ্যোগ হিসেবে বলতে হয় গ্রামীণ কমিউনিকেশনস-এর পল্লী কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রোগ্রামের উদ্যোগে টাঙ্গাইলের মির্জাপুর অঞ্চলে স্থাপিত টেলিসেন্টারটির কথা। এই টেলিসেন্টারটি ঢাকায় অবস্থিত গ্রামীণ-এর সদর দপ্তরের সঙ্গে অয়্যারলেস লিংক-এর মাধ্যমে

সংযুক্ত। এই সেন্টারটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের তথ্যচাহিদা মেটানোর পাশাপাশি নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে আরো অনেকগুলো সেবা দিয়ে থাকে যার মধ্যে আছে ফ্যাক্স, ইমেইল, ডেস্কটপ প্রকাশনা, গ্রামীণ যুবকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান, দূরশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়াও স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে এ সেন্টারটি আইএসপি হিসেবেও সেবা দিয়ে থাকে। গ্রামের কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষ যাতে এই টেলিসেন্টার থেকে তথ্য ও যোগাযোগ সেবা সহ অন্যান্য সেবা নিতে পারে সেজন্য তারা ব্যানার পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে নিয়মিতভাবে জানিয়ে থাকে। ভবিষ্যতে একটি ভার্চুয়াল লাইব্রেরির মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে সিডি-রম এবং অনলাইন গ্রন্থাগার সেবা দেয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে মির্জাপুর সেন্টারের।

এছাড়াও বাংলাদেশে টেলিসেন্টার স্থাপনে গ্রামীণ সাইবার সোসাইটির উদ্যোগও স্মরণীয়। এই বেসরকারি সংস্থাটি পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকার নিকটবর্তী বেরাইদ অঞ্চলে একটি টেলিসেন্টার স্থাপন করেছে। এই টেলিসেন্টারের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ করে নারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন তথ্য বিতরণের পাশাপাশি পেশাগত প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

ডি.নেট-এর **পল্লীতথ্য কেন্দ্র** পল্লী উন্নয়নে টেলিসেন্টার উদোগের সফল প্রয়োগের একটি উদাহরণ। ২০০১ সালে ডি.নেট পল্লী তথ্যকেন্দ্র উদ্যোগের সূচনা করে। প্রাথমিক গবেষণা কর্মের পর ২০০৫ সালে নীলফামারী, নেত্রকোনা, নোয়াখালী ও বাগেরহাট জেলার চারটি গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে চারটি পল্লী তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে ডি.নেট। দরিদ্র পল্লী মানুষের কাছে উন্নন তথ্যকে পৌঁছে দেবার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করতে থাকে এসব পল্লী তথ্যকেন্দ্র। প্রতিটি পল্লী তথ্যকেন্দ্রে ছিল ৩টি কম্পিউটার, ২/৩টি মোবাইল ফোন, ইউপিএস, ডিজিটাল ক্যামেরা, সয়েল টেস্ট কিট, নেবুলাইজার, ওজন মাপার যন্ত্র এবং জীবন জীবিকার তথ্যসমৃদ্ধ ডাটাবেস 'জিওন আইকেবি'। এসব কেন্দ্র গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্ক এবং EDGE প্রযুক্তির সাহায্যে সংযুক্ত ছিল। সেপ্টেম্বর ২০০৫ থেকে সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত

আবদুল-হ এইচ কাফি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জে.এ.এন. এ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব। গ্রামের একজন কৃষক ঘরে বসেই জানতে পারে তার উৎপাদিত পণ্য কোন বাজারে কি দামে বিক্রি করা যাবে। তখন সে অনুযায়ী সে উৎপাদন পরিকল্পনা করতে পারে। এছাড়া উৎপাদনের সময় উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্যগুলো, যেমন কী ধরনের সার দিতে হবে, কিভাবে পোকা দমন করা যাবে এগুলো তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তারা জানতে পারবে। এজন্য সাধারণ মানুষের উপযোগী কনটেন্ট ডেভেলপ করা দরকার। আমাদের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যদি গ্রামের মানুষের উপযোগী করে কনটেন্টগুলো বাংলায় ডেভেলপ করে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তা মানুষেল দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারে তাহলে খুবই ভাল হয়। এজন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংশি-ষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের ওয়েবসাইটগুলোকে বাংলা ভাষায় ডেভেলপ করে তাহলে সাধারণ মানুষ তথ্যপ্রযুক্তির দিকে গুরুত্ব দেবে এবং এ থেকে উপকৃত হবে।

আমাদের দেশে প্রতিটা গ্রাম বা ইউনিয়ন পর্যায়ে একটা পোস্ট অফিস আছে। এখন চিঠির প্রচলন একেবারেই কমে গেছে, কিন্তু পোস্ট অফিসের অবকাঠামোটা থেকে গেছে। এ অবকাঠামোকে ব্যবহার করে সেখানে যদি কম্পিউটার দেয়া হয় বা রেডিও লিংক বা সমজাতীয় টেকনোলজির মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ভিস দেয়া যায় তখন কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাটা ভালভাবে পাবে। গ্রামের মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো খুঁজে নিতে পারবে। সাধারণ মানুষ যখন দেখবে ওখানে গেলে তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো, যেমন অসুস্থ হলে কী করতে হবে, কোথায় যেতে হবে, এসব পাবে তখন তারা নিজেরাই এসব মাধ্যম ব্যবহার আকৃষ্ট হবে। আমাদের গ্রামেগঞ্জে পেটের পীড়া বা এরকম অসুখ বিসুখ একটা সাধারণ সমস্যা। এসব অসুখ বিসুখের অন্তত ৫০ ভাগ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে যদি গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা যায় - তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। শিক্ষার ব্যাপারেও তাই। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে, যদি প্রত্যন্ত এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধাটা পৌঁছে দেয়া যায় তাহলে মানুষের মধ্যে শহরমুখী হবার প্রবণতাটা কমে যাবে। আজকে যদি ঢাকার মত সব অবকাঠামোগত সুবিধা গ্রামে বসে পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই তারা বাড়ির সবাইকে ছেড়ে এতদূর আসবে না। শহরের উপর থেকে কিছু মানুষের চাপ তো কমবে। উন্নত বিশ্বে কিন্তু তাই হয়েছে। তারা খুব বেশি শহরমুখী নয়, নিজ নিজ অঞ্চলেই সব সুবিধা থাকায় প্রয়োজনে শহরে আসে, কাজ শেষে ফিরে যায়। এটার একমাত্র কারণ হল, ছোট শহর বা গ্রামে বসেই তারা সব সুবিধা পাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের জন্য আরও ইউনিক হতে পারে যেহেতু তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এটা সহজে করা যায়।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তারের অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতা আছে। সবচেয়ে বড় হচ্ছে অবকাঠামোগত অসুবিধা। এক্ষেত্রে কিন্তু সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা সবকিছুই করতে চাই বিরাট আকারে, পৃথিবীর উন্নত দেশে কি হয়েছে সেটা চিন্তা করি। কিন্তু সেটা না করে আমরা যদি কিছু পাইলট প্রকল্প চালু করে কাজ শুরু করে দিতে পারি তাহলে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়া যাবে। যেমন, আমরা পরিকল্পনা করতে পারি, ৬৪টি জেলার মধ্যে একটা বা দুটো জেলায় আগামী ছয় মাসের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত সব অবকাঠামো তৈরি করব। এভাবে ধীরে ধীরে ৪/৫ বছর পরে দেখা যাবে সমস্ত দেশের মানুষ তথ্যপ্রযুক্তির সম্পৃক্ততায় চলে এসেছে এবং মানুষ তখন তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিজের জীবনমানকে উন্নত করতে পারছি। তা না করে আমরা সব কিছু একবারে করার চিন্তা করছি। যেমন সরকারের কথা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ করব, সবকিছু একসাথে করব। অথচ আমাদের সাধারণ মানুষের অনেকেই কিন্তু এখন কম্পিউটার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। তাদের প্রয়োজন অবকাঠামো, তাদের প্রয়োজন উপকরণ। সেই অবকাঠামো ও উপকরণের জন্য সরকার কিন্তু প্রস্তুত নয়। সরকার, সরকারের মন্ত্রী, সরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি আমলা সবাই কথা বলাতেই ব্যস্ত, কাজ আর এগোচ্ছে না। কাজেই আমাদের এখন কথা না বলে কাজ করা উচিত। প্রয়োজনে ছোট ছোট পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। সরকারের কিন্তু মোবাইল ফোনের জন্য তেমন কিছুই করতে হয়নি। মোবাইল ফোনটাকে কেবল উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কম্পিউটার, তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রেও তাই। এত বেশি কথা না বলে কেবল অবকাঠামোটা সরকার তৈরি করে দিক, প্রযুক্তিকে এগিয়ে নেওয়ার বাকি কাজ সাধারণ মানুষ নিজেরাই করতে পারবে।

বাংলাদেশের প্রায় ১০ হাজার গ্রামবাসী পল-ী তথ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করেন এব জীবন জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহযোগী সেবা গ্রহণ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে স্থানীয় জনগণের মধ্যে এসব তথ্যকেন্দ্রের মালিকানা হস্তান্তরেরও প্রক্রিয়াও শুরু হয়। পল-ী তথ্যকেন্দ্র উদ্যোগ যাত্রা শুরু করে একটি গবেষণা উদ্যোগ হিসেবে। টেলিসেন্টার পরিচালনায় এ অব্দি যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে এ ধরনের সেন্টার সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে চায় ডি.নেট। এরই মধ্যে ৫০টিরও বেশি সংগঠন ডি.নেট থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে টেলিসেন্টার উদ্যোগকে ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করেছে সারা দেশে। ডি.নেট-এর মতই **গ্রামীণফোনের কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার**ও একটি সফল টেলিসেন্টার উদ্যোগ হিসেবে সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের সর্ববৃহৎ মোবাইল ফোন সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন ২০০৬ সালে Community Information Centre বা CIC স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। প্রথম পর্যায়ে ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬টি সিআইসি স্থাপন

করা হয় বরিশাল ছাড়া দেশের পাঁচটি বিভাগে। এর মধ্যে সিলেট, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগে স্থাপন করা হয় চারটি করে আর ঢাকা ও চট্টগ্রামে স্থাপিত হয় দু'টি করে। ২০০৬-এর মে মাসে আরো ১০টি সিআইসি স্থাপন করা হয়; এর মধ্যে ৭টি চট্টগ্রাম, দু'টি ঢাকা এবং ১টি রাজশাহী বিভাগে। প্রতিটি সিআইসিতে আছে অন্তত একটি করে কম্পিউটার, একটি প্রিন্টার, একটি স্ক্যানার, একটি ওয়েবক্যাম এবং একটি EDGE-enabled মোডেম যার সাহায্যে ইন্টারনেটে সংযোগ নেয়া যায়। প্রতিটি সিআইসি-ই স্থানীয় জনসাধারণের মালিকানায় পরিচালিত হয়, এজন্য স্থানীয় পর্যায় থেকে ন্যুনতম ৮০ হাজার টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে।

প্রতিটি সিআইসি-ই গ্রামীণ ফোনের একটি ফ্রাঞ্চাইজি হিসেবে পরিচালিত হয়। সিআইসি-র সাহায্যে গ্রামের মানুষরা দেশে বিদেশে অবস্থানরত তাদের বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এব ইমেইল, ফ্যাক্স ও ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সুবিধা ববহার করতে পারে। তারা ওয়েবকামের সাহায্যে দেশ বিদেশে অবস্থানরত বন্ধু ও আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিংও করতে পারে। এছাড়া অনলাইনে পাসপোর্ট ফর্ম, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সার্টিফিকেট ও সরকারি অন্যান্য তথ্যও সংগ্রহ করা যায়। সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের মূল্যসহ অন্যান্য তথ্যও পেতে পারেন গ্রামের মানুষরা। এছাড়া বেকার যুব সমাজ চাকুরি খোঁজার জন্য এবং ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর পড়াশোনার জন্যও সিআইসি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। সাফল্যের ধারাবাহিকতায় সারা দেশে মোট ৬০

হাজার কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে গ্রামীণ ফোনের।

দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সাহায্য সংস্থা **ঢাকা আহসানিয়া মিশন**ও তাদের গণকেন্দ্র উদ্যোগের মাধ্যমে পলী জনগণের তথ্যচাহিদা মেটানোর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আহসানিয়া মিশনের প্রথম গণকেন্দ্র উদ্বোধন করা হয় ১৯৮৭ সালে। সে থেকে এ পযন্ত তারা পলী জনগণের মধে জীবনব্যাপী শিক্ষা ও তথ্যসেবা দেয়ার লক্ষ্যে ১০০টিরও বেশি গণকেন্দ্র স্থাপন করেছে। এর মধ্যে আইসিটি ভিত্তিক কেন্দ্রের সংখ্যা ৫টি। মানুষ এসব কেন্দ্রে এসে পত্রপত্রিকা পড়া ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে জানতে পারে। প্রযুক্তিসমৃদ্ধ কেন্দ্রগুলো মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক তথ্য যোগাযোগের প্রয়োজনে কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে।

রিলিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অনলাইন ২০০৩ সালে **ইন্টারনেট লারনিং সেন্টার (ILC)** নামে একটি উদ্যোগ হাতে নেয়। ২০০৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এসব সেন্টার। বর্তমানে সারা দেশজুড়ে গোটা তিরিশেক ILC কাজ করছে। মূলত চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল-া, যশোর, খুলনা ও রাজশাহী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে এসব টেলিসেন্টার। প্রতিটি টেলিসেন্টারই কোনো না কোনো উপজেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত। প্রতিটি ILC-তে আছে ইউপিএস সংযোগসহ ৫ থেকে ১০টি কম্পিউটার, একটি লং ব্যাক আপ আইপিএস, একটি স্ক্যানার এবং একটি ডিজিটাল ক্যামেরা। এসব ILC-র কোথাও কোথাও ব্রডবান্ড ইন্টারনেট কানেকশন আবার কোথাও আছে ডায়াল আপ ইন্টারনেট কানেকশন। ILC-গুলো স্কুল ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। শিক্ষকরাও এখান থেকে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ পান। ILC থেকে ছাত্রছাত্রীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশের অন্য অংশের ছাত্রছাত্রীদের সফঙ্গ মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে থাকে। ইন্টারনেট এছাড়াও তাদের জন্য তথ্য সংগ্রহের একটি মাধ্যমে হিসেবে কাজ করে।

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের আরেকটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ হল **সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা**। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের নদীবিধৌত এবং জলাবদ্ধতা আক্রান্ত অঞ্চলে নৌকার মাধ্যমে প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন সেবা মানুষের কাছে পৌছে দেবার ব্রত নিয়ে যাত্রা শুরু করে সিধুলাই। এসব সেবার মধ্যে আছে শিশু শিক্ষা, গ্রন্থাগার, টেকসই কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার শিক্ষা ও ইন্টারনেট সেবা। তাদের ব্যাপকভিত্তিক কর্মকা রে মাধ্যমে সিধুলাই এরই মধ্যে উত্তরাঞ্চলের নদী তীরবর্তী ৮৮,০০০ পরিবারের কাছে শিক্ষা, কৃষি তথ্যসহ অন্যান্য সেবা পৌছে দিচ্ছে। সিধুলাই-এর নৌকা স্কুল এরই মধ্যে দেশে বিদেশে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। নৌকা স্কুলের মাধ্যমে নদী তীরবর্তী গ্রামগুলোর ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালাভ করতে পারছে। ক্লাস শেষে ছাত্রছাত্রীদের আবার নৌকা করে যার যার বাড়িতে পৌছে দেয়া হয়। প্রতিটি নৌকা স্কুলের সঙ্গেই আছে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা। কোনো কোনো নৌকা স্কুলে আছে ১৫০০ থেকে ২০০০ বই, ইন্টারনেট সংযোগ সহ দুই থেকে চারটি কম্পিউটার, প্রিন্টার এবং মোবাইল ফোন। শিশু, যুবসমাজ, বয়স্ক মানুষ এবং বিশেষ করে নারীরা এসব নৌকা তথ্যকেন্দ্র থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিতে পারেন এবং কৃষি, জৈব বৈচিত্র্য, জলবায়ু পরিবর্তন, চাকুরির সুযোগ, ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলায় অবস্থিত **ইয়ুথ কমিউনিটি মাল্টিমিডিয়া সেন্টার**ও একটি উলে-খযোগ্য টেলিসেন্টার। 'ইয়ং পাওয়ার ইন

সোশ্যাল অ্যাকশন' নামে একটি সংস্থা এই টেলিসেন্টারটি পরিচালনা করছে। ২০০৫ সালে স্থাপিত এ সেন্টারটিতে কম্পিউটার, ডিজিটাল ভিডিও কামেরা, অডিও রেকর্ডার, ক্যাসেট পে-য়ার, ক্যাবল টিভি, ক্যাবল রেডিও, ডিভিডি পে-য়ারসহ আধুনিক সব প্রযুক্তিগত সুবিধা রয়েছে। এ সেন্টারে এছাড়াও আছে লাউডস্পিকার, যার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য বা বার্তা স্থানীয় জনসমাজের মধ্যে বিতরণ করা যায়। তথ্য বিতরণের জন্য ব্যবহৃত আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে বুলেটিন বোর্ড। এ সেন্টারে ডায়াল আপ ইন্টারনেট সংযোগ আছে। এ টেলিসেন্টারটির মূল টার্গেট গ্রুপ হচ্ছে স্থানীয় যুব সমাজ। সেন্টারের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া পথনাটক, যাত্রাপালা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায়ও উন্নয়ন বার্তা পৌঁছে দেবার কাজ করে এ টেলিসেন্টারটি। এখানে আয়োজিত সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হাজার হাজার মানুষকে আকর্ষণ করে।

জাতিসঙ্ঘ উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে **কমিউনিটি ই-সেন্টার (Community e-centre)** নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকার পরিবর্তন ও টেকসই সামাজিক উন্নয়ন। এসব সেন্টার গ্রামীণ এলাকার প্রতিশ্রুতিশীল যুব সমাজকে লাইমলাইটে নিয়ে আসার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সম্ভাবনাময় এই যুবশক্তি যাতে দেশ গড়ার কাজে অংশ নিতে পারে সেটি নিশ্চিত করাই এসব সেন্টারের লক্ষ্য। গ্রামের মানুষ এসব সেন্টার থেকে টেক্সট ভিত্তিক বিভিন্ন কনটেন্ট (তথ্য) পেয়ে থাকেন। এসব কনটেন্ট স্থানীয় ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়। এছাড়া যেসব সেবা দেয়া হয় তার মধ্যে আছে বিভিন্ন সরকারি সেবা (জন্ম, মৃত্যু রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ফর্ম), স্থানীয়ভাবে চাহিদা আছে এমন জীবন জীবিকা সংক্রান্ত তথ্য, প্রিন্টিং, ফটোকপি, ডিজিটাল ফটোগ্রাফি ইত্যাদি সেবা, কম্পিউটার ট্রেনিং ও অন্যান্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং, মৌলিক ইন্টারনেট সেবা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ এডুকেশন সোসাইটি (BFES)-এর উদ্যোগে নেয়া হয়েছে **আমাদের গ্রাম** প্রকল্প। এ প্রকল্পটি মূলত গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজকে ভিত্তি করে এবং উদ্যোক্তারা চাইছেন একে সামাজিক উন্নয়নের উদ্ভাবনমূলক একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে সবার সামনে তুলে ধরতে। 'আমাদের গ্রাম' উদ্যোগের মূলমন্ত্র হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সমন্বয়, বিশে-ষণ এবং ব্যবহার করে তাদের জীবন মান উন্নয়নে সেটিকে ব্যবহার করা। 'আমাদের গ্রাম' উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল গ্রামীণ সমাজের এসব তথ্যই প্রতিনিয়ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর ফলে গ্রামীণ মানুষের সামাজিক জীবন, প্রথা, আচার আচরণ, অর্থনৈতিক কর্মকা , প্রযুক্তির ব্যবহার, পেশা ইত্যাদি সম্বন্ধে হালনাগাদ প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে।

'আমাদের গ্রাম' প্রকল্পের অধীনে সংগৃহীত উপাত্ত কার্যকর ব্যবহারের জন্য প্রক্রিয়াকরণ, বিশেষণ ও যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সংরক্ষিত এ তথ্য আবার সৃষ্টি করছে নতুন তথ্যের। এভাবেই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য অমূল্য বলে বিবেচিত তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার) গড়ে উঠেছে। গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ভূমিকা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রশিক্ষণ খরচ, প্রশিক্ষণ হাতিয়ার ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর তথ্য আছে এ ডাটাবেসে। গ্রামাঞ্চলে মানবসম্পদ উনড়বয়নে প্রশিক্ষণ বা জ্ঞান বিতরণ সংক্রান্ত এসব তথ্য পালন করতে পারে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা। শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের উপরও রয়েছে সমৃদ্ধ ডাটাবেস। সেখানে স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের উপাত্ত, ঝরে পড়া শিশু, তাদের ঝরে পড়ার কারণ ও প্রতিকার ইত্যাদি বিষয়ে আছে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত। গ্রামের স্কুলে শিশুদের ঝরে পড়ার কারণ নির্ধারণ ও এর প্রতিবিধানে এসব তথ্য অনেক কাজে আসবে।

দারিদ্র্য বিমোচনকে সামনে রেখে স্থানীয় সরকার বিষয়ক তথ্য উপাত্তের ভাণ্ডার গড়ে তোলায়ও প্রয়াসী হয়েছে 'আমাদের গ্রাম' প্রকল্প। এ মুহূর্তে 'আমাদের গ্রাম' যেসব প্রকল্প কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে তার মধ্যে আছে: স্তন ক্যান্সার চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা প্রকল্প, ডাটাবেস প্রোগ্রাম, জ্ঞান কেন্দ্র (নলেজ সেন্টার), জীবনজীবিকার জন্য সাক্ষরতা (লিটারেসি ফর লাইভলিহুড), তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন ও রুরাল নিউজ অনলাইন।

প্র্যাকটিকাল অ্যাকশন বাংলাদেশ নামে একটি বেসরকারি সংস্থা **রুরাল টেকনোলজি সেন্টার (আরটিসি)** নামে দুটো টেলিসেন্টার স্থাপন করেছে মাদারীপুর জেলার রাজৈর এবং জামালপুর জেলার সরিষাবাড়িতে। আরটিসি-র মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়ন। প্রথাগত ও স্থানীয়ভিত্তিক প্রযুক্তিকে উন্নয়ন করে সেটিকে আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলা ও অন্য এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানোও এসব সেন্টারের ঘোষিত লক্ষ্য। আরটিসিগুলোতে প্রথাগত গ্রন্থাগার এবং ইন্টারনেট সযোগসহ কম্পিউটারও আছে। এসব কম্পিউটারের সাহায্যে গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে কৃষক, ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ যাতে তথ্য ও প্রযুক্তি সেবা পেতে পারেন তার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়। আরটিসিগুলোতে ফটোকপি, এগ্রো প্রসেসিং ইত্যাদি সেবা ছাড়াও পল্লী জনগণকে বহুমাত্রিক বিভিন্ন সেবা দেয়ার লক্ষ্যে গেইন ময়েশ্চার মিটার, রিফ্র্যাক্ট মিটচার, পিএইচ মিটার, স্যালাইনোমিটার, এসিড টিট্রেশন টেস্ট, স্পাইস গ্রাইন্ডার, ডিজিটাল থারমোমিটার, মাইক্রোওয়েব ওভেন, মিল্ক ক্রিম সেপারেটর, বে-ন্ডার, মিক্সিং ট্যাংক, সিলিং মেশিন, হিট গাম ইত্যাদি যন্ত্র সংরক্ষণ করা হয়।

'ওয়ার্ল্ডনেট' নামে একটি বেসরকারি সস্থা আধুনিক প্রযুক্তিকে গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ নিয়ে স্থাপন করেছে **গে-াবাল ইনফরমেশন সেন্টার বা জিআইসি**। ওয়ার্ল্ডনেট-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সারা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে জিআইসি স্থাপন করা। এসব জিআইসি যেসব সেবা দিচ্ছে তার মধ্যে আছে ভিডিও কনফারেন্সিং, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইমেইল এবং অনলাইন চ্যাট, কম্পিউটার কম্পোজ, স্ক্যানিং, প্রিন্টিং, সিডি রাইটিং, অনলাইনে বিভিন্ন তথ্যসেবা, জনসচেতনতামূলক সেবা, টেলিমেডিসিন, ফ্যাক্স, ডিজিটাল স্টুডিও ইত্যাদি। এজন্য প্রতিটি জিআইসিতে ডেস্কটপ পিসি, প্রিন্টার, স্কানার, ফ্যাক্স, তারবিহীন ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি সুবিধা আছে।

'বিএনএনআরসি' নামে আরেকটি বেসরকারি সংস্থা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালনা করছে ১১টি টেলিসেন্টার যেগুলো **রুরাল নলেজ সেন্টার** বা **RKC** নামে পরিচিত। এসব সেন্টার শহর ও পল- এলাকার মধ্যে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইস তথা প্রযুক্তি বৈষম্য দূর করতে চায়। এসব সেন্টার যেসব সেবা দিচ্ছে তার মধ্যে আছে তথ্যসেবা, কম্পিউটার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ইন্টারনেট ও ইমেইল সেবা, টেলিফোন, ল্যামিনেটিং, ফটোকপি ইত্যাদি সেবা।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ডিজিটাল তথ্যসেবা পৌঁছে দেবার ব্রত নিয়ে কাজ করে চলেছে ব্র্যাকনেট-এর **ই-হাট (E-hut)**। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে এসব ই-হাট স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে ব্র্যাকনেট। এসব ই-হাট ব্রাকনেট-এর ফ্র্যাঞ্চাইজি হলেও এগুলোর মালিকানা এবং পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্ব থাকবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর। এসব E-hut থেকে যেসব সেবা দেয়া হবে তার মধ্যে আছে অনলাইন ব্রাউজিং, মৌলিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ফটোকপিয়িং, ডিজিটাল ফটো সার্ভিস, ল্যামিনেটিং ইত্যাদি। ব্র্যাকনেটের পক্ষ থেকে এসব ই-হাটে অয়্যারলেস ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। প্রতিটি ই-হাট-এর চাহিদা অনুযায়ী ব্যান্ডউইথ প্রদান করবে ব্রাকনেট। এসব ই-হাট আবার স্থানীয়ভাবে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে কাজ করবে। এ মুহূর্তে গড়ে প্রতিটি ই-হাট অপারেটর ২৫ থেকে ৩০টি সাবস্ক্রাইবারের কাছে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করছে। একটি সাধারণ ই-হাটে যেসব প্রযুক্তি কাজ করছে সেগুলো হচ্ছে রেডিও মোডেম, ডেস্কটপ পিসি, সুইচ, সফটঅয়্যার (উইন্ডোজ, লিনাক্স, এমএসওয়ার্ড, ইলাসট্রেটর, ফটোশপ), স্ক্যানার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার এবং ডিজিটাল ক্যামেরা।

'ডিজিটাল ইকুইটি নেটওয়ার্ক (ডিইএন)' ক্যাটালিস্ট নামে একটি মাল্টি ডোনার কনসোর্টিয়ামের আর্থিক সাহায্য নিয়ে **ঘাট: রুরাল আইসিটি সেন্টার (GHAT: Rural ICT centre)** নামে তিনটি টেলিসেন্টার পরিচালনা করছে। এসব সেন্টার বগুড়ার কাহালু ও শিবগঞ্জ এবং জয়পুরহাটের পাঁচবিবি এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে ২০০৬ সালে। টেলিফোন, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইন্টারনেট সংযোগ, ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ এসব সেন্টারের অবস্থান উপজেলা সদর দপ্তরে। মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদেরকে তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান করাই এসব রুরাল আইসিটি সেন্টারের লক্ষ্য। এ প্রকল্পের জন্য বাজার গবেষণা কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছে ডি.নেট এবং একটি ভারতীয় সংস্থা। এসব আরআইসি স্থানীয় ব্যবসায় উদ্যোক্তাসহ নির্বাচিত বিভিন্ন গ্রাহক যেমন পোলট্রি, ফিশারিজ ইত্যাদি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়িক তথ্য বিতরণ করে থাকে। এছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়েও তথ্য ও পরামর্শ সেবা প্রদান করে আরআইসি। প্রতিটি আরআইসিতে আছে ৪টি করে কম্পিউটার, ১টি কালার প্রিন্টার, ১টি স্ক্যানার এবং ৩টি ডিজিটাল ক্যামেরা।

যেতে হবে অনেক দূর

বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে এখন যেতে হবে অনেকটা দূর। বাগেরহাটে আয়োজিত জ্ঞান উৎসব আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, আমাদের সাধারণ মানুষরা এখন তথ্যপ্রযুক্তিকে তাদের জীবনে বরণ করে নিতে পুরোপুরি প্রস্তুত। বাগেরহাটের পথ ধরে একে একে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা, প্রতিটি উপজেলা, প্রতিটি গ্রাম ও জনপদে একদিন তথ্যপ্রযুক্তির আবাহনী গান বাজবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। সেদিন গ্রামের স্কুল পড়ুয়া শিশুটিও ইন্টারনেটে তার কোর্স ম্যাটেরিয়াল খুঁজবে অথবা সহজ সরল কৃষকটিও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে খুঁজবে তার উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সম্ভাব্য বাজার। পল্লী বাংলার প্রতিটি গ্রাম, দূরবর্তী প্রতিটি কোন সেদিন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযক্তির আশীর্বাদ ধন্য হবে। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় দূর হবে কুসংস্কার, দারিদ্র্য আর অশিক্ষা। আমরা বিশ্বাস করি, একুশ শতকের এই সব সম্ভবের দুনিয়ায় বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম প্রযুক্তির আলোয় ভেসে যাওয়ার দিন আর খুব দূরে নয়। আমরা সেদিনের অপেক্ষায় কান পেতে আছি। ■

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ টেলিসেন্টার নেটওয়ার্কসহ বিভিন্ন সংগঠনের ওয়েব সাইট